যুগান্তর

শতফুল ফুটতে দাও: বই পড়াও হতে পারে একটি আন্দোলন

প্রকাশ : ০৩ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. মাহবুব উল্লাহ্

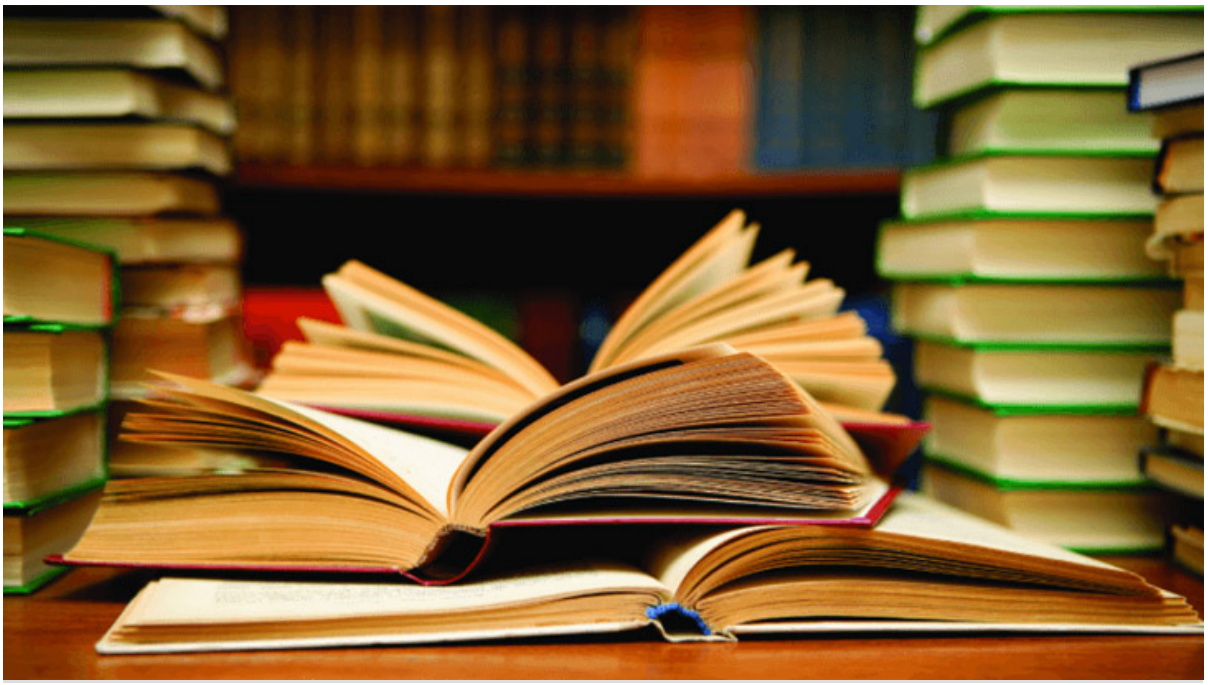

জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, ‘হে প্রভু তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও যাতে আমি আরও বেশি করে বই পড়তে পারি।’ এমন প্রার্থনা তার পক্ষেই করা সম্ভব, যিনি আজীবন জ্ঞান সাধনা করেছেন এবং জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন। আমরা যারা সাধারণ তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কিছুই চাই, কিন্তু বই পড়ার জন্য বেঁচে থাকার আকুতি জানাই না। এখানেই হল একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন জ্ঞান সাধকের পার্থক্য।

প্রাচীন চীনা সভ্যতায় বেশকিছু জ্ঞান সাধক ছিলেন, যারা জ্ঞান সাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন, এরূপ একজন জ্ঞান সাধকের কথা জানা যায়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। রাতের বেলায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেল কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। এ মানুষটি বেশকিছু জোনাকি পোকাকে বোতলে ভরে সেগুলোর আলোতে রাতের বেলায় বই পড়তেন। আরেকজন জ্ঞান সাধকের কথা জানা যায় যিনি তার মাথার চুল রশি দিয়ে ঘরের আড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন।

গভীর রাতে বই পড়তে পড়তে ঝিমুনি এলে রশিতে বাঁধা চুলগুলোতে টান পড়ত, ফলে তার ঝিমুনি কেটে যেত। বর্তমান বাংলাদেশে দুর্বৃত্ত কালচারে এ ধরনের মানুষকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করা হয়। সমাজে জ্ঞানের কদর নেই, কিন্তু বিত্তের কদর আছে। সেজন্যই মুষ্টিমেয় সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষ যারা এখনও বাংলাদেশের সমাজে টিকে আছেন, তাদের অনেক সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়। এই তাচ্ছিল্য শুধু বিত্তশালীরাই করে না, রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যারা আপনজন, তারাও এ ব্যাপারে কম যান না।

ব্রিটিশ শাসনামলে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছে বিপুল উৎসাহে এবং নিজেদের জ্ঞানের পরিধিকেও বিস্তৃত করেছে। জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারে গল্প-উপন্যাস ছাড়াও অনেক জ্ঞানসম্ভারে

সমৃদ্ধ গ্রন্থাদি থাকত। শহরের পাঠকরা গ্রন্থাগারের নিরিবিলি পরিবেশে যার যার পছন্দমতো বই পড়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিত। এর ফলে এসব পাঠক মননশীলতার দিক থেকে উন্নত মানুষে পরিণত হতো।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার লেখক হয়ে উঠতেন। পুলিশে যারা চাকরি করে তাদের নিয়ে সমাজে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। দিনে দিনে এ নেতিবাচক ধারণা আরও প্রকট হয়েছে। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন এক দারোগা সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। যতক্ষণ আমি তার সান্নিধ্যে ছিলাম ততক্ষণই তিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে গল্প করেছেন। তার কাছেই শুনলাম এমিল জোলার কথা, দস্তয়ভস্কির কথা, টলস্টয়ের কথা। বাংলা সাহিত্যের নামজাদা সব লেখককে নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

একজন পুলিশের লোক এরকম সাহিত্যপ্রেমিক হতে পারেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। দারোগা-পুলিশদের সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল এ মানুষগুলোর কাজ-কারবার চোর-ডাকাত, খুনি ও সমাজবিরোধী অপরাধীদের নিয়ে। এদের মতো মানুষের সাহিত্যের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে তা আমি তখন পর্যন্ত ভাবতে পারিনি। বর্তমান বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীতে এ ধরনের কর্মকর্তার সংখ্যা কত তা জানা যায় না।

তবে পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে এ বাহিনীর লোকদের মধ্যে পাঠাভ্যাস সম্পর্কে যদি একটি জরিপ চালানো হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম, পুলিশ কীভাবে জনগণের বন্ধু হয় এবং কেন হয় না। বই পড়ে মানুষের রুচি ও মননশীলতার উন্নয়ন হয়। আমাদের পুলিশ বাহিনীতে যে নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা হয়তো কিছুটা হলেও হ্রাস পেত, যদি এ বাহিনীর মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানো সম্ভব হতো।

সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। হেন অপরাধ নেই যা আজ বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে না। এসব অপরাধ নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার সব সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য অনেক কারণই দায়ী। তবে গ্রন্থবিমুখতা কম দায়ী নয়। যদি দেশব্যাপী বই পড়ার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করা সম্ভব হতো তাহলে হয়তো সামাজিক মালিন্য অনেকটাই হ্রাস পেত।

মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। কোনো খারাপ আসক্তিকে দূর করতে হলে ভালো কোনো আসক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদিক থেকে পাঠের প্রতি আসক্তি খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু পাঠ করার কথাই বলব কেন? দেশকে জানা, সমাজকে জানা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করাও বড় ধরনের কাজ। এর ফলে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্র তারা নিশ্চয়ই ভিনসেন্ট স্মিথের নাম শুনে থাকবেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস নিয়ে তিনি বেশ কিছু কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ ভদ্রলোক ছিলেন একজন ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট। উত্তর প্রদেশে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানেই তার চোখে কোনো প্রাচীন ভবন বা কোনো শিলালিপি বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইস্টক খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেগুলো তিনি গভীরভাবে পরখ করে দেখেছেন এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাজনীতির চেহারা কেমন ছিল তা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ।

ব্রিটিশ শাসকরা খুব ভালো করেই জানত এ উপমহাদেশে তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে হলে এ অঞ্চল, এ অঞ্চলের জনবসতি, এ অঞ্চলের জীবনযাত্রা, এ অঞ্চলের দারিদ্র্য, নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যে জনগোষ্ঠীকে শাসন করা হবে তাদের যদি না জানা যায় তাহলে শাসনকর্ম অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা দেখি তৎকালীন ইংরেজ অফিসাররা অনেক মূল্যবান প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানী তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেছে। এগুলো ইংরেজ সরকার মুদ্রিত আকারেও প্রকাশ করেছে।

এগুলো ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস গবেষণার জন্য মূল্যবান উপাদান। এভাবে ভারতীয় সমাজ তথা প্রাচ্য সমাজকে জানতে গিয়ে জ্ঞানের একটি নতুন শাখা সৃষ্টি হল। এটি 'প্রাচ্যবিদ্যা' বা Orientalism নামে পরিচিত। আজ কথায় কথায় হাজার বছরের বাঙালির কথা বলা হয়। কিন্তু হাজার বছরের বাঙালিকে জানার এবং তার তমসাচ্ছন্ন অতীতকে বোঝার জন্য প্রয়াস কোথায়? কোনো ভিনসেন্ট স্মিথকে আজকাল কি আর দেখা যায়? সরকার মেগা প্রজেক্টে অনেক টাকা ঢালছে। এ অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে অপচয় ও দুর্নীতিতে হারিয়ে যাচ্ছে তা তো বালিশকাণ্ডসহ নানা কাণ্ডে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যদি এ অর্থের কিছুটা গণপাঠাগার উন্নয়ন এবং শিশু, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হতো তাহলে সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস করা সম্ভব হতো।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস অফিসের একজন করণিক। তার কাছে তার দফতরের অধীন এলাকার অনেক মানুষ আসত স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তিনি বলতেন, আমি আপনার কাজটি করে দিতে পারি একটি বিশেষ শর্তে, যদি আপনি আপনার এলাকা থেকে কিছু পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করে আমার জন্য নিয়ে আসতে পারেন।

জনশ্রুতি আছে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এভাবে ৭ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এভাবেই লোকচক্ষুর সামনে এসেছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সব রত্নরাজি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যদি এমন ভিন্নধর্মী ঘুষের আশ্রয় না নিতেন তাহলে হয়তো বাংলার মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য আমাদের অজানাই থেকে যেত। ড. আহমদ শরীফের মতো ব্যক্তি এসব পুঁথির ওপর গবেষণা করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছিলেন।

অনেকে মনে করেন, ই-বুক বা ই-রিডার ও ট্যাবলয়েড আবিষ্কার হওয়ার ফলে ছাপা বইয়ের কদর ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের জরিপ থেকে জানা গেছে, ছাপা বইয়ের জনপ্রিয়তা ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত বইয়ের তুলনায় অনেক বেশি। বইকে জনপ্রিয় করার জন্য রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য খুবই প্রয়োজন। নরওয়েতে যদি কেউ বই ছাপে তাহলে সরকার এর ১ হাজার কপি কিনে সারা দেশের গ্রন্থাগারগুলোতে পৌঁছে দেয়। শিশুদের বই হলে সরকার কিনবে ১ হাজার ৫০০ কপি।

নরওয়ের তুলনায় আমাদের দেশ অনেক বেশি জনবহুল। সরকার এদেশেও বই কিনে গণগ্রন্থাগারগুলোতে পাঠায়। তবে এর জন্য আর্থিক বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। সরকারিভাবে বই কেনা নিয়ে রাজনীতি ও দুর্নীতি দুটোই হয়। সরকার যদি আন্তরিকভাবে বই পড়ার আন্দোলনকে বেগবান করতে চায়, তাহলে তার উচিত হবে দেশের সেরা গ্রন্থপ্রেমিক লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বই বিতরণ, গ্রন্থাগার সংস্কার এবং হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম গ্রন্থগুলো খুঁজে বের করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা। এক কথায় একটি শক্তিশালী পাঠাগার আন্দোলন অপসংস্কৃতির অপনোদন ঘটিয়ে সু-সংস্কৃতির সুবাতাস ছড়িয়ে দিতে পারে।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।